ইসলাম ঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ

এম. এম. আকাশ*

ভূমিকা

ইসলামের মৌলিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রবনতাগুলি কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে উৎসারিত। মুসলীমরা সাধারণভাবে এও দাবী করেন যে পবিত্র কুরআন শরীফ ও রসুলে পাকের হাদিসের সুত্রসমূহ এযাবৎকাল মোটামুটি অপরিবর্তিত ধারায় চলে আসছে। কিন্তু এটাও বাস্তব সত্য যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জীবনযাত্রা স্বতঃপরির্তনশীল। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা কেন্দ্রীয় রাজশক্তি তথা খিলাফৎ প্রতিষ্ঠা, সেই শক্তি কর্তৃক নতুন সাম্রাজ্য বিস্তার এবং পরবর্তীতে সেই সাম্রাজ্যের পতন ইত্যাদি সব-কিছুরই নির্দিষ্ট পরিবর্তনশীল ইতিহাস রয়েছে। সেই অর্থে দেশে দেশে, কালে-কালে, ইসলামের বৈচিত্র্যময় রূপভেদ রয়েছে। কিন্তু এসব নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ইহলৌকিক মানদণ্ড ব্যবহার করে ইসলামের এই বৈচিত্রময় রূপকে বিচার করতে গেলে কুরআন ও সুন্নাহ্র অলংঘনীয়-তায় বিশ্বাসী ধর্মানুরাগীদের অন্তরে আঘাত লাগার আশংকা রয়েছে। তদুপরি ঐ আঘাত নির্বিরোধী ধর্মানুরাগীরা নম্রভাবে মেনে নিলেও উগ্র বা গোঁড়াপন্থীরা তা আদৌ সহজভাবে গ্রহণ করবেন না। ফলে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে ঐহিক মানদণ্ড প্রয়োগ করে মুক্ত আলো-চনার সুযোগ কম। বিশেষতঃ কখনো কখনো সংস্কারমুক্ত আলোচকের/ লেখকের কোন একটি সংবেদনশীল বক্তব্যকে কেন্দ্র করে লেখকের প্রাননাশ থেকে শুরু করে এমনকি দাঙ্গা হাঙ্গামারও সূত্রপাত হতে পারে। এসব আশংকা থাকার কারণে বর্তমান প্রবন্ধের লেখক এই প্রবন্ধে

* অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্য পন্থা অবলম্বন করাই আপাততঃ শ্রেয়ঃ মনে করেছেন। এক দিকে লেখককে খেয়াল রাখতে হয়েছে ক্ষিপ্ত তথাকথিত মোল্লাবৃন্দ যেন অনর্থক উত্তেজিত হওয়ার সুযোগ না পায় আবার অন্যদিকে তাকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যথাযথ প্রেক্ষিতটি যথাসম্ভব সঠিকভাবেই তুলে ধরার নীতি বজায় রাখতে হয়েছে। ফলে প্রবন্ধের বক্তব্য কোথাও কোথাও ইচ্ছকৃতভাবেই যথেষ্ট মূর্তায়িত করা হয় নি। তাই ইঙ্গিত-ধর্মীতা এই প্রবন্ধের প্রধান দুর্বলতা। তবে লেখকের বিশ্বাস, "আক্‌ল্‌মন্দ পাঠকের জন্য ইশারাই কাফি।"

আরেকটি কথা শুরুতেই বলে নেয়া ভাল যে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সাধারণ ধর্মভীরু মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করা নয়। তবে ধর্মব্যবসায়ীদের এই প্রবন্ধে ক্ষমা করা হয় নি। তবু লেখার বিশেষ ভঙ্গীর কারণে কোন প্রকৃত ধর্মনুরাগী যদি অন্তরে আঘাত পান তাহলে সে জন্য লেখক অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থী।

ঐতিহাসিক বিবর্তনের আলোকে ইসলাম

কাব্যপ্রিয়, অতিথি পরায়ন লড়াকু বেদুইনদের দেশ আরব। উত্তরে সিরিয়া, ইরাক এবং পারস্য। দক্ষিণে লোহিত সাগর। তারও ওপারে ইথিওপিয়া। এই দুই এর মাঝখানে মরুভূমির দেশ আরব। প্রাক-ইসলাম যুগে আরব ছিল বাইরের সভ্যতা-বঞ্চিত। সে সময় দামেস্ক. সিরিয়া এবং ইয়ামেন নগরীতে খৃষ্ট ধর্মের, গ্রীসিয়-রোমান সভ্যতার স্পর্শ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আরবীয়রা তখনও ছিলেন প্রধানতঃ মুর্তিপূজায় ব্যস্ত।* মরুভূমিতে পশুচারণকারী একাধিক গোত্র এবং নিয়ত অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত ছিল আরব-জাতি। গোত্রগুলির মূল সম্পদ ছিল অশ্ব, ভেড়া, ছাগল এবং উট। অন্যতম প্রিয় খাদ্য ছিল খেজুর ও সুরা। প্রতিটি গোত্রই ছিল কম বেশী সংগ্রামী এবং নিয়ত বিচরণশীল। সমগ্র পরিস্থিতি রবী ঠাকুরের সেই বিখ্যাত চরনগুলি মনে করিয়ে দেয়, "হতেম যদি আরব বেদুঈন, চরনতলে বিশাল মরুদিগন্তে নীলিম।"

---

* অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ দ্য কুরআন এর ভূমিকায় এ ধরনের কয়েকটি মূর্তির আরবী নাম উল্লেখ করেছেন যেমন : হিউবাল, ওয়াদ, নাসের, এল-হজ্জা, আল্লাহ্ তাআলা, ইত্যাদি।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক জাফরুল্লাহ্ খাঁন বলেছেন, "প্রতিটি গোত্রই মোটামুটি একটি সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন। তাদের স্বল্প সম্পত্তি তথা উটগুলি এবং ভেড়াগুলি নিয়ে পানি এবং তৃণভূমির সন্ধানে বছরের বিশেষ বিশেষ ঋতুতে, বৃষ্টিপাতের খামখেয়ালীপনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা ঘুরে বেড়াতেন।" (১, পৃঃ ১৬) গোত্রীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে যারা পরাজিত হোত তাদেরকে দাসে পরিণত করার বিধান ছিল। সুতরাং দাসপ্রথার চল্ ছিল আরবে। এ ছাড়া মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল খুবই নীচুতে—মানুষ নয় একান্ত ব্যক্তিগত বহনযোগ্য সম্পত্তি হিসাবেই গণ্য করা হোত তাদেরকে, সুতরাং তদানীন্তন আরবীয় সমাজে প্রধান নির্যাতিত গোষ্ঠী দুইটি ছিল দাস এবং মহিলা।

দূরাঞ্চলের সঙ্গে প্রাক-ইসলামী যুগে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল আরবদের। ব্যবসায়ীরা উটের কাফেলায় বা জাহাজে করে পণ্য আমদানী রপ্তানী করতেন সুদূর সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, এমনকি ভারত থেকেও। আরবের এ রকম একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র, তীর্থস্থান ও নগর ছিল মক্কা। মক্কার প্রধান আকর্ষণ ছিল হযরত ইব্রাহিম (আঃ) প্রতিষ্ঠিত তীর্থ প্রতিষ্ঠান কাবা-শরীফ। আর কাবা শরীফ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল তদানীন্তন মক্কার অন্যতম শক্তিশালী কোরেশ গোত্রের হাতে। মরুচারী বেদুইন সভ্যতার তুলনায় অপেক্ষাকৃত অগ্রসর এই বাণিজ্যকেন্দ্র মক্কায় ৫৭০ খৃস্টাব্দে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ৪০ বছর পর ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐশীবাণী লাভ করেন এবং ৬১২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তিনি নিজে ছিলেন শাসক গোত্র কোরেশদের বংশোদ্ভূত—কিন্তু তাঁর অনেক আত্মীয় স্বজনই তখন তাঁর প্রচারিত ধর্মমত গ্রহণ করেন নি। মূর্তিপূজার স্থলে তিনি এক আল্লাহ্‌র উপাসনার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। ঘোষণা করে-ছিলেন সৃষ্টিকর্তার সামনে সকলের সম অধিকারের কথা। উল্লেখযোগ্য যে, দাসদেরকেও তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানিয়েছিলেন। যে ৪ জন লোক সর্বপ্রথমঃ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল তার মধ্যে ১ জন ছিলেন দাস। মহিলাদের ব্যাপারেও তদানীন্তন মাপকাঠিতে হযরতের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অপেক্ষাকৃত উদার এবং নমনীয়।

ইসলামের জন্মকালে যে ঐতিহাসিক পটভূমি উল্লিখিত হোল তা থেকে বোঝা যায় যে নগর ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রসর কেন্দ্রভূমিতেই

ইসলামের উদ্ভব ও প্রাথমিক বিকাশ সাধিত হয়েছিল। মোহাম্মদ (দঃ) নিজে ধনী বিধবা বিবি খাদীজা (রাঃ) কে বিবাহ করেছিলেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে দেশ-দেশান্তর গমন করেছিলেন। সুতরাং ধর্ম হিসাবে ইসলাম কখনোই ব্যবসা-বাণিজ্য তেজারতি কারবারের বিরোধীতা করে নাই। তবে বেদুঈন মরুচারীদের মধ্যে প্রাক-ইসলামী যুগে অবাধ আনন্দবাদের যে লীলাখেলা চালু ছিল (যেমন—মদ্য-পান, ব্যাভিচার, লুণ্ঠণ, প্রতিশোধবৃত্তি, ইত্যাদি।) তা অবশ্য ইসলাম অনুমোদন করে নি। বস্তুতঃ তদানীন্তন সমাজে ইসলাম একটি ভার-সাম্যপূর্ণ ইহলৌকিকতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। সুতরাং কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র যেমন একাংশ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন দার্শনিক বিধি বিধান তেমনি অপর একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে নানারকম ইহলৌকিক বিষয়কেন্দ্রীক নির্দেশ উপদেশ ইত্যাদি।* ইসলামের আদি যুগে (হযরত (দঃ) এবং তদ্‌পরবর্তী চার খলীফার আমল) এই ভারসাম্যপূর্ণ ইহ-লৌকিকতা বজায় থাকলেও পরবর্তীতে তা আর বজায় থাকে নি। বিশেষতঃ উমাইয়া এবং আব্বাসীয়দের অধীনে ইসলাম ক্রমশঃ একটি সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির ধারক-বাহকে পরিণত হয়। ইসলামের এই দ্বিতীয় যুগে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি, খ্যাতি ও জৌলুষের যেমন প্রসার ঘটেছিল তেমনি পাশাপাশি অপরিমিত ভোগ-বিলাস, যুদ্ধ, হানাহানি, ইত্যাদির প্রকোপও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় উল্লিখিত আছে যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি স্বতন্ত্র ধারা প্রকাশ লাভ করে। ইসলামের অতিরিক্ত প্রসার, ভোগ-বিলাস ও অতি মাত্রার ইতজাগতিকতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ধারার বিপরীতে

---

* এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক পি.কে হিট্টি তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ "History of the Arabs"-এ লিখেছেন, "বিজয়ের যুগে অবতীর্ণ মদীনার সূরা সমূহ দীর্ঘ বাগবহুল এবং আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সমৃদ্ধ। এই গুলিতে ধর্মীয় বিধিসমূহ এবং নামাজ, রোজা, হজ্জ ও পবিত্র মাস সমূহের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ গুলিতে আরো রয়েছে মদ, শুকর, জুয়াখেলা, নিষিদ্ধকারী আইনসমূহ, জাকাত ও জিহাদের ব্যাপারে রাজস্ব ও সামরিক আইন কানুন, খুন, প্রতিশোধ গ্রহণ, চুরি, সুদ খাওয়া, বিবাহ ও তালাক, অবৈধ যৌনক্রিয়া এবং ক্রীতদাস মুক্ত করা সংক্রান্ত বেসামরিক ও ক্রিমিন্যাল আইনসমূহ।"

'সুফী' মতবাদের উদ্ভব হয়। সুফীবাদের অনুসারী পীর-আউলিয়া-দরবেশগণ এই পৃথিবীতেই সৃষ্টিকর্তার সংগে এক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্য ঘোষণা করলেন। তাঁরা বিলাস পরিহার, অলৌকিক গুণাবলী অর্জন, রহস্যময় অতীন্দ্রিয়বাদ চর্চা, অ-আনুষ্ঠানিকতা এবং গ্রামীণ লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে আরবীয় ধ্রুপদী ইসলামের সংশ্লেষণ প্রয়াসী হলেন। (২, পৃঃ ৯১৯) এই ধারা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল—গ্রাম-গ্রামান্তরে সহজে প্রসারিত হয়েছিল। এইভাবে চিরায়ত ইসলামের বিশুদ্ধতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং বিভিন্ন স্থানীয় লোকাচার ও সংস্কারের সংগে তা মিশ্রিত হয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন দেশে গোঁড়া-পন্থীদের সংগে সুফীপন্থীদের বিরোধ ও পার্থক্য ঘণীভূত আকার ধারণ করেছিল। ভারতীয় উপমহাদেশেও একেক সময় একেক ধারার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সম্রাট আকবরের আমলে সুফী ধারার চরম বিকাশ পর্বে দীন-ই-এলাহী প্রবর্তনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। আবার পরবর্তীতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে ইসলামের বিশুদ্ধতা পুনরুদ্ধধারের জন্য কঠোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। (২, পৃ ৯১৯)।

সুফী ধারার লোকজ ভিত্তির কারণেই এই ধারায় যেমন রয়েছে সরলতা, উদারতা, সাম্য প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী। তেমনি এর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে নানা কুসংস্কার অন্তর্মুখীনতা এবং সংসার বিমুখতা। তাই আধুনিক সংস্কারপন্থী মুসলীম নাগরিকেরা সুফী ধারাকে কখনোই মনে প্রাণে গ্রহণ করেন নি। অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সুফীবাদকে ভর্ৎসনা করে আল্লামা ইকবাল লিখেছেন, "বর্তমানে মুসলমানরা হেলেনীয় ও পারসিক রহস্যময় অতীন্দ্রিয়বাদের উপত্যকায় লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে অধিক পছন্দ করে। আর এই রহস্যময় অতীন্দ্রিয়বাদ চার পাশের কঠোর বাস্তবতার প্রতি তাদের দৃষ্টিকে বন্ধ রাখতে শেখায় এবং তাদেরকে স্থিরভাবে একটি দিকেই তাকিয়ে থাকতে বলে যাকে 'জ্যোতি' হিসাবে বর্ণনা করা হয়। ...আমার কাছে এই আত্মিক প্রহেলিকা, এই নৈরাজ্য অর্থাৎ সত্যকে সেখানে খোঁজা যেখানে তা নেই, হচ্ছে একটি দৈহিক লক্ষণ যা আমাকে মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পচনের সূত্রটি যুগিয়ে দিচ্ছে। (The present day Muslim prefers to roam about aimlessly in the valley of Hellenic Persian mysticism, which teach us to shut our eyes to the hard

reality around and to fix our gaze at what is described as illumination · · · to me this selfmystification, this nihilism, i.e. · · · seeking reality where it does not exist, is a physiological symptom, giving me a clue to the decadence of the muslim world.")* ইসলামী সুফীবাদের ধারাটি লোক সমাজে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত নীরবে নিভৃতে আজো প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আর গোঁড়াপন্থী ধারাটি বহু তর্জন-গর্জন করে অবশেষে বিশুদ্ধ "ইসলামী মৌলবাদে" রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং ঐতিহাসিক ব্যাখ্যানুযায়ী ইসলামী মৌলবাদ হচ্ছে রক্ষণশীল, ঐতিহ্যাশ্রয়ী এবং বিশুদ্ধতাবাদী মতবাদ। পক্ষান্তরে সুফী মতবাদ হচ্ছে উদার বহির্মুখী এবং খাপ খাইয়ে নেওয়ার চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। তাই ইতিহাসের বিচারে ইসলামী মৌলবাদী হচ্ছে একটি প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদমুখী মতবাদ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সম্প্রতি এই "ইসলামী মৌলবাদের" নবায়ন ঘটেছে। তাদের মধ্যে এমন কতকগুলি বিশিষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রবণতার উদ্ভব ঘটেছে যা তাদের বর্ধিত সঞ্জিবনী শক্তির ভেতর দিয়ে প্রকাশ লাভ করছে। ফলে অনেক অমৌলবাদী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিও মৌলবাদীদের দ্বারা সামাজিকভাবে আকৃষ্ট ও বিভ্রান্ত হচ্ছেন। আজ তাই মৌলবাদীদের প্রকৃত স্বরূপ আরো বিস্তৃত ও পুংখানুপুংখুভাবে উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। মৌলবাদের সংগে অন্যান্য প্রতিযোগী আধুনিক ভাবাদর্শসমূহের (পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র) সম্পর্কও সঠিকভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন। পরবর্তী অধ্যায়ে সেই প্রয়াস নেয়া হোল।

ইসলামী মৌলবাদ প্রসংগে

ইসলামী মৌলবাদীরা সর্বস্ববাদী একটি গোষ্ঠী। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসনের প্রয়োগে বিশ্বাসী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী। সারা দুনিয়ায় "ইসলামী অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি" কায়েমই এদের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং এরা ইসলামকে ঐশী ব্যবস্থা হিসাবে অন্য সকল মানবসৃষ্ট মতবাদের উর্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে স্থান দিয়ে থাকেন। তবে বিভিন্ন দেশে এই আন্দোলন বিভিন্ন নামে পরিচিত। সাম্প্রতিক বিশ্বে এদের মধ্যে পাকিস্তানের জামাতে

* এই পংক্তিগুলির রচনাবর্ষ ১৯১৭।

ইসলাম গোষ্ঠী (যা বাংলাদেশেও পরবর্তীতে বিস্তৃত হয়েছে), মিশরের 'ইসলামিক ব্রাদারহুড' আন্দোলন এবং নব উত্থিত 'ইরানের ইমাম খোমেনী পরিচালিত আন্দোলনের[১] নাম উল্লেখযোগ্য।

"মুসলীম ব্রাদার" সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্না বলেছিলেন, "ইসলাম হচ্ছে একটি বিশ্বাস—একটি রীতি, একটি জাতি এবং জাতীয়তা, একটি ধর্ম এবং একটি রাষ্ট্র, বিশ্বাস এবং কর্ম, পবিত্র গ্রন্থ এবং অসি।"[৩] ("Islam is a faith and a ritual, a nation and a nationality, a religion and a state, spirit and deed, holy text and sword.")

উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি সকল মৌলবাদীদের সাধারণ বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্বসূচক। কৌশলগত কারণে এরা বিভিন্ন দেশে তাদের এই পূর্ণ মতামতটি অর্ধ গোপন-অর্ধ প্রকাশ্য রাখতে পারেন অথবা এদের নিজেদের মধ্যেও এই মতামতের বাস্তবায়ন কৌশল নিয়ে মত পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু একটি বিষয়ে তারা সকলেই একমত—তা হচ্ছে সমাজতন্ত্র বা ধনতন্ত্র নয় পৃথিবীর মুক্তির জন্য তৃতীয় এবং একমাত্র বিকল্প হচ্ছে "ইসলামী বিপ্লব"। সচরাচর এরা অসহিষ্ণু, অন্য সকল মতামতের উগ্রবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠত্ববাদী হয়ে থাকেন। তাদের এই উগ্রতা ও আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে ইসলামের ঐশী শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস। "বাঁচলে গাজী এবং মরলে বেহেশ্ত" এই বিশ্বাস তাদেরকে স্বীয় আদর্শের জন্য এক "নির্ভিক অটল যোদ্ধায়" রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়! এজন্য এদেরকে একার্থে FANATIC ধর্মান্ধ হিসাবে অভিহিত করা চলে।

বর্তমান দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক শিবির ও ধনতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, এরা তা স্বীকার করেন না। এই দ্বন্দ্বকে খাটো করে বরং উভয় শিবিরের সাধারণ ঐতিহ্যকে (কমন হেরিটেজ) এর সামনে তুলে ধরেন। তাদের মতে—

ক) আমেরিকান ও সোভিয়েত উভয় শিবিরই গ্রীসিয়-রোমক সভ্যতার উত্তরাধিকারী! উভয় অঞ্চলেই খৃষ্ট ধর্ম প্রধান ধর্ম এবং উভয়েই উনবিংশ শতকের বুদ্ধিবাদ (রেশনালিজম) এবং জ্ঞানালোক যুগের (এনলাইটেনমেন্ট) অনুসারী।

খ) পোষাকের দিক থেকেও এরা মুসলিমদের মত নয়, যেমন—

পুরুষরা উভয় অঞ্চলেই প্যান্ট-শার্ট এবং মহিলারা স্কার্ট পরে থাকেন।

গ) উভয় অঞ্চলের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় একই ধ্রুপদী সংগীত, চিত্রকলা এবং নাটক দেখে থাকেন এবং পছন্দ করেন। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রেও এদের রুচি সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য।

ঘ) নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে এদের উভয়ের দৃষ্টিভংগী এক রকম। মহিলা ক্রীড়াবিদ, মিশ্র শিক্ষা ব্যবস্থা, মিশ্র সাঁতার, নৃত্য, নৈশ ক্লাব ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই এরা সমদৃষ্টিভংগীর অধিকারী।

ঙ) উভয়েরই অধীনে কোন না কোন সময় উপনিবেশ ছিল এবং বর্তমানে তাদের উভয়ের প্রভাবাধীন "নয়া-উপনিবেশ" রয়েছে।

সুতরাং মুসলীম মৌলবাদীরা পাশ্চাত্য বনাম প্রাচ্য, ইসলাম বনাম কাফের, এইভাবে বিভিন্ন সামাজিক দ্বন্দ্বকে সাজাতে আগ্রহী। সোভিয়েত এবং আমেরিকার দ্বন্দ্বকে তারা একই শিবিরের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব হিসাবে চিত্রিত করে থাকে। এরা আশা পোষণ করে থাকে যে এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলেই এক সময় না এক সময় ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় শিবিরের আত্মবিলুপ্তি ঘটবে এবং ইসলাম তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হবে। অতীতে মধ্যযুগের ইসলামী সভ্যতার বিজয় ও ঐশ্বর্যের পতনের জন্য এরা ইউরোপীয় সভ্যতাকেই দায়ী করে থাকে এবং বর্তমান বিংশ শতকে মুসলমানদের হত-দরিদ্র অবস্থার জন্য ইউরোপীয়/পাশ্চাত্য সভ্যতার সংক্রমণকেই দোষী সাব্যস্ত করেন।

মৌলবাদীদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপে উপরোক্ত বিশ্লেষণের সত্যতা প্রতিফলিত হয়েছে। একদিকে মৌলবাদীরা ইরানের পাশ্চাত্যপন্থী শাহকে উৎখাত করেছে, অন্যদিকে আফগানিস্তানে মৌলবাদীরা পাশাপাশি সোভিয়েতপন্থী পিপলস্ ডেমোক্রেটিক পার্টির (পি. ডি. পির নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখেছে। সুদানের প্রেসিডেন্ট নিমেরী মৌলবাদকে ব্যবহার করেই কমিউনিস্টদের হত্যা করেছিল, আবার ইরানে মার্কিনী ডিপ্লোম্যাটদের প্রায় এক বছরের মত মৌলবাদীরাই আটকাবস্থায় রেখে দিয়েছিল। মৌলবাদীরা মিশরের পাশ্চাত্যপন্থী রাষ্ট্রপতি নোবেল শান্তি পুরষ্কার বিজয়ী সাদাতকে হত্যা

করেছে, আবার সিরিয়াতে ১৯৭৭-৮০ কালপর্বে তারা সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের ব্যক্তিগতভাবে হত্যা করার অভিযান পরিচালনা করেছে।

সুতরাং মৌলবাদীরা কি পুঁজিবাদ কি সমাজতন্ত্র উভয়ের মৌলিক শত্রু। তাই তাদের দেয়াল লিখনগুলির মধ্যে একটি অত্যন্ত প্রিয় লিখন হচ্ছে, "পুঁজিবাদ সে তো দারিদ্রের অভিশাপ, সমাজতন্ত্র সে তো আত্মার বন্দীশালা, একমাত্র ইসলামই হচ্ছে মানবতার মুক্তিসনদ"। তবে মৌলবাদীরা তাদের বক্তব্যের এই বিশুদ্ধতা বাস্তবে সর্বদা বজায় রাখেন নি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মৌলবাদীরা বিশেষ বিশেষ শিবিরের প্রতি অধিকতর বিরূপতা বা মিত্রতা প্রদর্শন করে থাকেন। যেমন ইরানের মৌলবাদীরা প্রথম পর্যায়ে সোভিয়েতের তুলনায় আমেরিকার প্রতি অধিক ক্ষেপা ছিল। কারণ সেখানে যে ক্ষমতাসীন শাহ্-এর বিরুদ্ধে মৌলবাদকে লড়াই করতে হয়েছিল তার পক্ষে আমেরিকার অবস্থান ছিল খুবই সুস্পষ্ট। এই জন্য ইমাম খোমেনী যখন উভয় শিবিরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন তখন আমেরিকার কথা একটু বেশী বলেন। ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে ইমাম উচ্চারিত নিম্নোক্ত বাক্যগুলি এই সত্যের প্রতিফলন, "আমেরিকা ব্রিটেনের চেয়ে মন্দ, ব্রিটেন আমেরিকার চেয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এদের উভয়ের চেয়ে মন্দ। তারা সকলেই মন্দ এবং একে অন্যের চেয়ে অধিক নাপাক। কিন্তু আজকে আমরা যাকে নিয়ে চিন্তিত সে হচ্ছে আমেরিকা"[৪]

খোমেনী যেমন আজ আমেরিকাকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তেমনি আবার পাকিস্তান বা আফগানিস্তানের মৌলবাদীরা আমেরিকার বদলে সোভিয়েতকেই তাদের প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তবে বামপন্থীরা বর্তমান বিশ্বের দুই প্রধান শিবিরের প্রতি মৌলবাদীদের বিরুপতার মাত্রাভেদকে স্বীকার করলেও মৌলবাদকে তারা মিত্র হিসাবে দেখেন না। ইরানে মৌলবাদীদের 'আমেরিকান বিরোধীতাকে' সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা হিসাবে ভেবে তুদেহ পার্টির যে করুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা বামপন্থীদের জন্য একটি যথেষ্ট শিক্ষা হিসাবে সামনে রয়েছে। ঠিক একইভাবে পাকিস্তানের জিয়াউর রহমানকে নিয়ে আমেরিকানরাও আজ আর সম্পূর্ণ স্বস্তি বোধ করছে না। অর্থাৎ মৌলবাদ যেমন উভয়ের প্রতি শত্রুতামুলক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে থাকে তেমনি আজকের বিশ্বে উভয় শিবিরই মৌলবাদকে শত্রু অথবা অনির্ভরযোগ্য

মিত্র হিসাবে গণ্য করে থাকে। তবে যদি সমাজতন্ত্রকে ঠেকাতে মৌলবাদ ছাড়া আর কোন উপায় না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী মহল মৌলবাদকেই বন্ধু হিসাবে মেনে নিতে পারে। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের উদাহরণটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

মৌলবাদীদের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে দুটি উপধারার বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ঃ

ক. রক্ষণশীল গোঁড়া "বিপ্লবী" ধারা।

খ. সংস্কারবাদী আধুনিকতাপন্থী ধারা।

প্রথমোক্ত ধারাটি কুরআন এবং সুন্নাহকে সকল অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক আইন কানুনের মূল উৎস হিসাবে দেখে থাকে এবং সেখান থেকে তারা এক চুলও নড়তে রাজী নয়। তারা ইউরোপ বিদ্বেষী, পুরাতন ইসলামী ঐতিহ্যের উপাসক এবং জেহাদ বা সশস্ত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তের প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দলভুক্তরা যুগের সংগে খাপ খাইয়ে নিতে আগ্রহী। মূলে তারাও কুরআন এবং সুন্নার অনুশাসনে বিশ্বাসী। কিন্তু এগুলির হুবহু অনুকরণ না করে নতুন অবস্থায় যুক্তি সহকারে তুলনার মাধ্যমে এগুলির প্রয়োগে এরা বিশ্বাসী। অর্থাৎ নতুন অবস্থায় কুরআন বা হাদীসের আক্ষরিক অর্থের প্রতি অনুগত না হয়ে বরং সকলে মিলে একমত হয়ে, নিজেদের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে মিমাংসায় পৌঁছাতে এরা আগ্রহী। এরা কুরআন এবং সুন্নাহর পাশাপাশি ইজতেহাদ ('এ্যানালজিকাল আর্গুমেন্ট) এবং ইজমায় (কনসেনসাস) বিশ্বাসী। কখনো, কখনো এরা সশস্ত্র বিপ্লবের পরিবর্তে নিরস্ত্র পন্থায় জনমতকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে যুগোপযোগী করে ইসলাম কায়েমে আগ্রহী হয়। নারী প্রশ্নে, শিক্ষা বিষয়ে, রাজতন্ত্রের স্থলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে প্রথমোক্তদের তুলনায় এরা অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত আধুনিক দৃষ্টিভংগীর পরিচয় দিয়ে থাকেন। তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, জামাল উদ্দিন আফগানী, কবি ইকবাল, প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন অংশতঃ এই দ্বিতীয় ধারার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট অনুসারী। কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি বিশ্বাসের দিক থেকে এরা ছিলেন অন্যান্য মৌলবাদীদের মত। কিন্তু পাশ্চাত্য আধুনিকতার প্রতি সহনশীল উদার দৃষ্টিভংগী থাকায় বাস্তব কর্মের ক্ষেত্রে এসে এরা কিছু কিছু

প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং বস্তুতঃ মৌলবাদ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে এ ধরনের আধুনিক সংস্কারমুক্ত আলেম সম্প্রদায়কে দোদুল্যমান মিত্র হিসাবে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল ও রয়েছে। তবে এরও পূর্বশর্ত হচ্ছে 'মৌলবাদের' মূল বৈশিষ্ট্য সর্বস্বতাবাদ থেকে এঁদের সরে আসা এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী গ্রহণ। বস্তুতঃ প্রাচীনপন্থী মৌলবাদীদের স্থলে বর্তমানে এই আধুনিক মৌলবাদীরাই ক্রমে ক্রমে সম্মুখ সারিতে উঠে আসছেন। বিশেষ করে যেসব উন্নয়নশীল দেশে শক্তিশালী জাতীয় বুর্জোয়া গোষ্ঠী অনুপস্থিত অথচ উপযুক্ত বাম শিল্পও গড়ে উঠে নি। সেখানে এই তৃতীয় ধারার দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই তৃতীয় ধারা ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক উভয় অর্থনীতির পরিবর্তে তৃতীয় বিকল্প "ইসলামী অর্থনীতির" শ্লোগানকে সামনে তুলে ধরে। তাদের মতে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হবে পুঁজিবাদের চেয়ে অধিকতর সাম্যভিত্তিক এবং সমাজতন্ত্রের চেয়ে অধিক গণতান্ত্রিক।

অর্থনীতি প্রসংগে ইসলাম

আরবে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর আবির্ভাবের লগ্নে আরবীয় অর্থনীতির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রথম অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে। মক্কায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও দাসতন্ত্রের উপস্থিতির দরুণ বিশেষ বিশেষ গোত্রাধিপতির হাতে যে প্রচুর ধন-সম্পদ তখন কেন্দ্রীভূত ছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। তবে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর প্রতিবেশী সাম্রাজ্য-গুলিতে (ইরান এবং বাইজেন্টাইন) অভিজাতদের হাতে সম্পদের কেন্দ্রী-ভবন মাত্রা আরো বেশী ছিল। ফলে সে সব দেশে সামাজিক সমতার (সোশ্যাল ইকুয়িটি) সমস্যাটি আরো তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর উপর এসব সমস্যা ও সমস্যাকেন্দ্রিক প্রচলিত আন্দোলনগুলির প্রভাব সম্পর্কে ফরাসী মার্কসবাদী পন্ডিত ম্যাক্সিম রডিনসন বলেন, "মোহাম্মদ (দঃ) এর ২০০ বছর আগে ইরানে কিছু তাত্ত্বিকের আবির্ভাব হয়েছিল যারা একটি বিশেষ অধিবিদ্যক ব্যবস্থার (মেটাফিজিকাল সিস্টেম) সংগে সম্পর্ক রেখে (সুবিধাভোগীদের) সুবিধা বিলোপ এবং সম্পদের যৌথকরণের কথা প্রচার করতেন।"[১] এই

মতবাদ পারস্যের রাজা কাওয়াদ (৪৪৮-৫৩১ খৃঃ) গ্রহণ করেন এবং আংশিকভাবে তখন তার রাজ্যে এর যাঁচাই ও কার্যকারীতা পরীক্ষা হয়েছিল। কিন্তু অবশ্যই কাওয়াদ তদানীন্তন সাম্যবাদী নেতা মাজদাক এর মূল নীতিগুলিকে অনেক কম বিপ্লবী আকারে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সম্পত্তির উপর পূর্ণ ব্যক্তিমালিকানা পরবর্তীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কাওয়াদের উত্তরসুরী ও পুত্র খসরু-১ এর আমলে যিনি ইতিহাসে আনোশারওয়ান (৫৩১-৫৭৯ খৃঃ) নামে পরিচিত। আনোশারওয়ানের রাজত্বের শেষ লগ্নে মোহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রতিবেশী শক্তিশালী সাম্রাজ্যের এসব সাম্যবাদী পরীক্ষা নিরিক্ষাগুলি নিয়ে আরবে তখন নিশ্চিতভাবেই নানা কথা-বার্তা চালু ছিল। মোহাম্মদ (দঃ) নিজেও মক্কায় ধর্ম প্রচারের শুরুতে বিত্ত ও বিত্তশালীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সম্পদের নিন্দা করেছিলেন কারণ তার মতে তা মানুষের মধ্যে অহংকারের সৃষ্টি করে এবং তাকে খোদার কাছ থেকে দুরে সরিয়ে দেয়। তবে তাঁর বক্তব্যে তিনি মাজদাক এবং মাজদাক এর শিক্ষক জারাদুস্ত এর মত সরাসরি সম্পত্তিকেই আক্রমণ করেন নি। সম্পত্তির মালিকানায় বৈষম্যের কারণে যে অন্যায়ের সৃষ্টি হয় তার প্রতিবিধানের জন্য তিনি ধনীদের উপর কর আরোপ এবং লব্ধ অর্থ দ্বারা রাষ্ট্র বা সম্প্রদায় প্রধান কর্তৃক দয়া-দাক্ষিণ্যের পরামর্শ দিয়েছিলেন। স্পষ্টতঃই এমনকি তখনকার সময়ের জন্যও এগুলি ছিল সংস্কারবাদী ধরনের (কর্মসূচী)।" (৫, পৃ ২২)।

সুতরাং ইসলামে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা, অপচয় ও কৃপনতার বিরুদ্ধে দয়া ও দানের কথা বেশ জোরালোভাবেই এসেছিল—কিন্তু কখনোই তা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদের ঘোষণায় পরিণত হয়নি। কুরআন শরীফে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বন্টনের ব্যাপারে নানা আয়াত রয়েছে—অর্থনৈতিক বৈষম্যকেও মেনে নেয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে।* পাশাপাশি দাসকে মুক্ত করার আহবান জানালেও হযরত মোহাম্মদ (দঃ) দাসমুক্তির পন্থা হিসাবে দাস বিদ্রোহের পরিবর্তে মুক্তিপণকেই

---

* পবিত্র কুরআনের ইংরেজী অনুবাদে উল্লিখিত আছে, "Do not covet what Allah hath bestowed in bounty upon one more than anothers." ম্যাক্সিম রডিনসন ১৯৭৭, এ উদ্ধৃত। দেখুন পৃ-২৪৯

গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন। ম্যাক্সিম রডিনসন মনে করেন যে ইসলাম মজুরী প্রথারও বিরুদ্ধে ছিল না তার ভাষায়, "Very many times the Koran speaks of the wages of man in relation to God. In one place it shows us Jethro the Midianits about to hire Moses as a wage earning shepherd." (৫, পৃ ১৪)

তবে মজুরী প্রথার স্বীকৃতির পাশাপাশি হাদীসে ন্যায্য মজুরীর কথা গুরুত্ব দিয়ে একাধিকবার উল্লিখিত আছে। সুতরাং ব্যক্তি মালিকানা, ধনবৈষম্য এবং মজুরী প্রথা ইসলামে স্বীকৃত। তবে পাশাপাশি ইসলামে এসবক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কারের কর্মসূচী রয়েছে। এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

১. জাকাত ও সদ্‌কা (বাধ্যতামূলক ধনী কর এবং দান-খয়রাত)।
২. রিবা (সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ)।
৩. জুয়া বা যে কোন ফাটকাবাজী ব্যবসা (স্পেকুলেটিভ ট্রেড) নিষিদ্ধ।
৪. অপবিত্র দ্রব্যের (যেমন—শুকর, মদ ও হারাম জন্তু-জানোয়ারের মাংস) উৎপাদন ও ব্যবসা নিষিদ্ধ।
৫. ওজনে কারচুপি বা ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ।
৬. যে কোন প্রকার ঠকানো বা অসৎ আদান-প্রদান নিষিদ্ধ।

সুতরাং সামগ্রিক বিচারে বলা যায় মূলগতভাবে আদি ইসলাম পুঁজিবাদের বিরোধী নয়। তাই বলে অবাধ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপশূন্য পুঁজিবাদকেও ইসলাম অনুমোদন দেয়নি। বস্তুতঃ আধুনিক কল্যাণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার (মর্ডাণ ওয়েলফেয়ার ক্যাপিটালিস্ট স্টেটের) সঙ্গেই ইসলামের আর্থিক বিধানের লক্ষ্যণীয় সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পুঁজিবাদী শোষণ কিন্তু তা সংস্কারসহ ভারসাম্য বজায় রেখে হওয়া চাই। কিন্তু আধুনিক মৌলবাদীরা পরবর্তীতে এই ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কারমূলক পুঁজিবাদের অবস্থান থেকে আরো দক্ষিণে সরে গেছেন। বিশেষতঃ আধুনিক মৌলবাদীদের অন্যতম মুখপাত্র মাওলানা আবুল—আলা মওদুদীর লেখনীতে পুঁজিবাদের প্রতি উলঙ্গ পক্ষপাতিত্বের যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে।

"ইসলামী অর্থনীতি" ও মাওলানা মওদুদীর ব্যাখ্যা

সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর দুটি ক্ষুদ্র পুস্তকের উপর ভিত্তি করেই বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা নির্মিত হবে। প্রথমটির শিরোনাম "অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান" (আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৬) এবং দ্বিতীয়টির শিরোনাম "ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ" (আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯)।

তবে এই আলোচনায় প্রবেশ করার আগে একটি সাংগঠনিক যোগাযোগ সংক্রান্ত সন্দেহ নিরসন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমানে যারা সংগঠিত তৎপরতা চালাচ্ছেন তাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুটি উপধারা বিদ্যমান। একটি উপধারা জনাব হাফেজ্জী-হুজুরের নেতৃত্বে "আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত" নামে পরিচিত। অপর ধারাটি গোলাম আযমের নেতৃত্বাধীন "জামাতে ইসলাম" নামে পরিচিত। এদের মধ্যে হাফেজ্জী-হুজুর পন্থীরা মওলানা মওদুদীর মতবাদকে "ইসলাম বিরোধী" হিসাবে বহু আগেই প্রত্যাখান করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের জামাতে ইসলাম এ প্রসংগে কখনোই সুস্পষ্টভাবে "হ্যাঁ" বা "না" বলে নি। কিন্তু হাফেজ্জী-হুজুর পন্থীদের মতে প্রকৃত পক্ষে জামাতে ইসলাম পন্থীরা বাংলাদেশেও মওলানা মওদুদীর মতবাদকেই অনুসরণ করে থাকেন। এই প্রসংগে তাদের মহল থেকে প্রকাশিত "মিষ্টার মওদুদীর নতুন ইসলাম" (সম্পাদনা: হযরত মাওলানা মনসুরুল হক, মুফতী, জামেয়া কোরআনিয়া তারাবিয়া, লালবাগ, ঢাকা) পুস্তকে তারা লিখেছেন,

"বিগত ১৯৮৩ ইং সনের ২৫শে এপ্রিল রোজ সোমবার সকাল আটটায় জামায়াতে ইসলামীর কয়েকজন প্রধান মুরুব্বী হযরত হাফেজ্জী হুজুরের দরবারে গিয়ে প্রায় দীর্ঘ দু-ঘণ্টা আলোচনার মাঝে কথার প্যাঁচে আটকে পড়ে বলেছিলেন—আমরা মওদুদী সাহেবকে নেতা মানি না। আমরা তো তার বই-পুস্তক হতে শুধু ঐ সমস্ত বিষয়বস্তু গ্রহণ করে থাকি— যা আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের খেলাফ নয়। হযরত হাফেজ-জী-হুজুর তাদেরকে মওদুদীর মতবাদ বর্জনের এ কথাটিকে প্রকাশ্য ঘোষণা দানের মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার পরামর্শ দিলেন। জামায়াতে ইসলামীর মুরুব্বী অঙ্গীকার করে বললেন— 'আমি আগেও বলেছি, এখনো বলতেছি যে, যদি

আমরা আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের খেলাফ কিছু করে থাকি তবে তা সংশোধন করে নিব।' কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দীর্ঘ দু-বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এ ব্যাপারে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বরং জামায়াতে ইসলামীর লোক সকল জোর গলায় মওদুদীর মতবাদের বুলিই আওড়িয়ে যাচ্ছেন। "এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে জামাতে ইসলাম এখনো মওদুদীরই অনুসারী। এ ছাড়াও জামাতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান কৃত "মওদুদীর জীবনী" এবং জামাতপন্থী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের রাজনৈতিক পাঠক্রম পর্যালোচনা করলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে জামাতপন্থীরা প্রকৃত পক্ষে মওলানা মওদুদী প্রদত্ত ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসহ ইসলামের অন্যান্য যাবতীয় মওদুদীয় ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ মওদুদীর নতুন ইসলামের সমালোচনা পরোক্ষভাবে মৌলবাদী জামাতে ইসলামের সমালোচনার সামিল। মওদুদীর মতাদর্শের সংগে জামাতের ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে তাই কারো মনে কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়।

এইবার মূল আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। আদি ইসলামে সমষ্টির কল্যাণ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পক্ষে যেসব সংস্কারমূলক বিধি-বিধান ছিল, মাওলানা মওদুদী প্রথমেই তার মুলোচ্ছেদ করেছেন। তার মতে, "ইসলামী সমাজ সংস্থা সঠিকরূপে বুঝিবার জন্য সর্বপ্রথম এই কথা জানিয়া লওয়া আবশ্যক যে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে আসল গুরুত্ব হইতেছে ব্যক্তির, সমাজ—জাতির বা সমষ্টির নয়।" (১৯, পৃঃ-৮৪)

এর পক্ষে তিনি নিজে যে কুযুক্তিটি ব্যবহার করেছেন তা কুরআন বা হাদিসের কোন উধৃতি নয়। তার নিজস্ব নির্মিত সাদৃশ্যমূলক যুক্তি বা ইজমা। তার মতে যেহেতু ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তি কৃতকর্মের জন্য আখেরাতে এককভাবে এবং ব্যক্তিগত ভাবে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করবেন সুতরাং এই দুনিয়াতেও ব্যক্তি শুধু ব্যক্তির নিজের প্রতিই দায়িত্বশীল হবেন। আখেরাতে অন্যের দায়িত্ব যেহেতু তার নয়—সেহেতু দুনিয়াতে অন্যের প্রতি কল্যাণমূলক কর্তব্য পালনের তাগিদও তার থাকবে না। বস্তুতঃ "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের" এরূপ চরম পূজা আমাদেরকে পুঁজিবাদী অবাধ প্রতিযোগিতার যুগের (Laissez Fairre) ভাবাদর্শের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আসলে মাওলানা মওদুদী যে অবাধ বাজার ব্যবস্থারই একজন

দৃঢ় সমর্থক ছিলেন তা এই পুস্তকে উদ্ধৃত আরেকটি ঘটনা থেকে আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। একদা হযরত জীবিত থাকাকালে মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ফলে খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে খাদ্য মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তখন মদীনাবাসী দল বেঁধে এসে হযরতকে দ্রব্যমূল্য বেঁধে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তখন মওদুদীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী হযরত (দঃ) নাকি সঠিক ভাবেই বাজারের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন। মওদুদী তার পুস্তকে এই কল্পিত ঘটনাটি বর্ণনার পর এই প্রত্যাখানকে সঠিক বলে স্বীয় মতামত প্রদান করেছেন। মাওলানা মওদুদী এই প্রসঙ্গে একটি ব্যাখ্যামূলক পাদটীকাও তার গ্রন্থে সংযোজন করেছিলেন। এই পাদটীকাটিও যথেষ্ট মাত্রায় কৌতুহলোদ্দীপক এবং অর্থপূর্ণ। মওদুদী পাদটীকায় লিখেছেন, "ইহার অর্থ এই নয় যে, নবী করীম (দঃ) দুর্মূল্যতাকে নিরংকুশ ভাবে চলিতে দেওয়ার পক্ষপাতী, উহার প্রতিবিধানের দিকে কোন লক্ষ্যই তিনি আরোপ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে কাজটি করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইতেছে সরকারের কৃত্রিম হস্তক্ষেপের ফলে দ্রব্যমূল্যের জটিল ব্যবস্থাকে চূর্ন-বিচূর্ন করিয়া দেওয়া। এই পন্থাকে পরিহার করিয়া স্বীয় শক্তি ব্যবসায়ী লোকদের নৈতিক সংশোধনের কাজে নিয়োজিত করিয়াছেন।" অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে "দ্রব্যমূল্য" নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি এতই জটিল যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও সেখানে কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা উচিৎ নয়। ঐ অবস্থাতেও দাম কমানোর জন্য ব্যবসায়ীদের বাধ্য করা উচিৎ নয়—উচিৎ হচ্ছে তাদের নৈতিক সদুপদেশ দান। আরো উল্লেখ্য যে যদিও মওদুদী পন্থীরা প্রগতিশীলদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য তাদের মতামত প্রচার, তাদের বক্তব্য শ্রবন ইত্যাদি ক্ষেত্রে খুবই সংকীর্ণ, অনুদার এবং মারমুখী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন কিন্তু ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের প্রতি তাদের দেখা যায় আশ্চর্যরকম ধৈর্য্যশীল নমনীয় উদার দৃষ্টিভঙ্গী। বস্তুতঃ শ্রেণী স্বার্থের অভিন্নতাই এই অদ্ভুত আচরনের মূল কারন।

ঐ একই পুস্তিকায় মওদুদী ধনীকদের উপর কমিউনিষ্টদের অত্যাচার প্রসঙ্গে লিখেছেন, "কমিউনিষ্টগণ উৎপাদন উপায়সমূহ ব্যক্তি-গত মালিকানা হইতে টানিয়া লইয়া জাতীয় মালিকানার পর্যায়ে ফেলিবার জন্য বল প্রয়োগ ও অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া থাকে।

কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য এই জুলুম—পীড়নমূলক লুণ্ঠনের পন্থা যদি অবলম্বন নাও করা হয় এবং উহার পরিবর্তে যদি জমি-জায়গা ও শিল্প-ব্যবসার প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইনের সাহায্যে ক্রমশঃ জাতীয় মালিকানায় পরিণত করার ক্রমবিকাশমান সমাজতন্ত্রের নীতি অবলম্বন করা হয়, তবুও ইসলামের প্রকৃতি উহাকে কিছুতেই কবুল করিতে পারে না। ...... কেননা এইসব নীতি আদর্শের সামগ্রিক স্বার্থ যাহাই হোক না কেন মানবীয় ব্যক্তিত্বের ক্রমবর্ধন ও পূর্ণত্ব লাভের ইহা সুস্পষ্টরূপে পরিপন্থী।" (৯, পৃঃ ৮৬)

সুতরাং কি বিপ্লবী কমিউনিষ্ট কি বিবর্তনবাদী সোশ্যালিষ্ট উভয়েই হচ্ছে মওদুদীর বিচারে "মানবীয় ব্যক্তিত্বের ক্রমবর্ধন ও পূর্ণত্ব লাভের পরিপন্থী। কিন্তু ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের আদমজী-সাইগল-দাউদ প্রমুখ একচেটিয়া বাইশটি পরিবার যখন ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ ভাবে সুদখোরী, মজুতদারী, মুনাফাবাজী, তথা শোষণের মাধ্যমে অসংখ্য "ব্যক্তির মানবীয় ব্যক্তিত্বের ক্রমবর্ধন ও পূর্ণত্বকে" অংকুরেই বিনষ্ট করে দিচ্ছিলেন তখন মাওলানা মওদুদীর চিত্তে কোন বিচলন ঘটে নি। বরঞ্চ তখন আদমজী-দাউদ-সাইগল প্রমুখ মুষ্টিমেয় ব্যক্তি-বর্গের ব্যক্তিত্বের অবাধ "মানবিক" (?) বিকাশ ও "পূর্ণত্বের" (?) সমস্যাই ছিল মওদুদীর কাছে অধিকতর জরুরী সমস্যা। শোষক শ্রেণীর পক্ষে এ ধরনের ঐতিহাসিক ওকালতির কারণে মাওলানা মওদুদী শুধু সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রীদের কাছে নয় এমনকি ধর্মানুরাগী মুসলমানদের চোখেও নিন্দার্হ হয়েছে। ইসলামপন্থী লেখক জনাব সদরুদ্দিন আহমেদ চিশ্‌তি তার ক্ষুদ্র পুস্তিকা "Islam Against Inequity and Maudoodi's Corruptions'—এ মন্তব্য করেছেন, "In the early part of 1970 a lecture of Maulana Maud odi was published in news papers in which he said that nationalisation is not only illegal but also un-islamic. The only point of argument he would try to raise in his favour is the existence of so-called private ownership of property. Besides this there is no expression in Quran and Hadith in support of this point, either direct or indirect nor can there be any,

Inspite of this fact, if Maudoodi would express such opinions in the name of religion, how then can we keep faith with him ? And why should he not be called as an agent of exploiters ?" (১০, পৃঃ-৪০-৪১)

সুতরাং শিল্পপতি-ব্যবসায়ী এমনকি পাকিস্তানী একচেটিয়া পুঁজি-বাদের পক্ষে মওদুদীর অবস্থান ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত সত্য। কিন্তু পাঠকের জন্য এর চেয়েও বড় চমকপ্রদ তথ্য হচ্ছে এই যে মওদুদী ছিলেন বৃহৎ সামন্ত ভূস্বামীদের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। মওদুদী "জমির মালিকানা" প্রসঙ্গে নিজেই লিখেছেন, "ইসলামে অপরাপর জিনিসের মত জমির উপরও ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে। ... ইহার কোন সীমাও নাই, এক গজ, বর্গমাইল হইতে কয়েক সহস্র একর পর্যন্ত যতখানি জমিই হোক না কেন, আইনসম্মত উপায়ে ও নিয়মে কাহারো মালিকানাভুক্ত হইলে সে অবশ্যই তাহার বিধিসম্মত মালিক হইবে—তাহা তাহার বৈধ মালিকানা সম্পত্তি রূপে গণ্য হইবে। নিজের জমি যে নিজেরই চাষাবাদ করিতে হইবে, এই মালিকানার বৈধতার জন্য তাহারও কোন শর্ত নাই। বাড়ীঘর ও আসবাবপত্র যেমন ভাড়ায় দেওয়া যায়, জমিকেও তেমনি ভাড়া হিসাবে লাগানো যাইতে পারে। ফসলের শরীকানা নিয়মেও কৃষিকার্য চলিতে পারে।" (১১, পৃঃ-৮৯)

উপরোক্ত উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে বৃহৎ ভূস্বামী কর্তৃক চাষী প্রজার খাজনা ভিত্তিক শোষণের বিষয়ে মওদুদী তার অনুকূল ফতোয়া দিচ্ছেন এবং একেই ইসলাম সম্মত বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। যদিও অবশ্য আমরা সকলেই জানি যে "আসমান-জমীন" সকল কিছুর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ এরূপ বক্তব্যও কুরআনে স্থান পেয়েছে। কিন্তু মওদুদীর "নূতন ইসলামে" এসব ব্যাখ্যা আদৌ স্থান পায় নি।

ব্যক্তিগত মালিকানা ও শ্রেণী শোষণের পক্ষে শুধু ধর্মের নামে ভুল ব্যাখ্যা ও ফতোয়া দিয়েই মওদুদী ক্ষান্ত হন নি—এর পক্ষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ঢং—এ নানা ভ্রান্ত যুক্তির অবতারনাও তিনি করেছেন। তিনি ব্যক্তিমালিকানাকে ও ব্যক্তিমালিকানাপ্রসূত বৈষম্যকে মানুষের চিরন্তন স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব হিসাবে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। মওদুদীর মতে, "তামদ্দুনের ক্রমবিকাশের সংগে সংগে অপরিহার্য রূপে (ক) বিভিন্ন

মানুষের মধ্যে ক্ষমতা ও যোগ্যতার স্বাভাবিক পার্থক্য বশতঃ কাহারো পক্ষে প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত, কাহারো প্রয়োজনানুযায়ী এবং কাহারো প্রয়োজনের অপেক্ষা কম উপার্জন করিতে পারা আবশ্যক ছিল। (খ) উত্তরাধিকারী নীতির দরুণ কাহারো জীবন প্রাচুর্যের ভিতর দিয়া শুরু হওয়া, কাহারো অপেক্ষাকৃত অভাব অনটনের এবং কাহারো নিঃস্ব ও সম্বলহীন অবস্থায় জীবন-যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়াও অপরিহার্য ছিল ··· (গ) প্রাকৃতিক কারণে প্রত্যেক সমাজেই জীবিকা এবং জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহে অক্ষম এক শ্রেণীর লোকের বর্তমান থাকাও অপরিহার্য হইয়াছিল। যেমন শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, পংগু ও অক্ষম, ইত্যাদি। (ঘ) প্রত্যেক সমাজে এমন লোক অবশ্যই থাকা দরকার ছিল, যাহারা অপরের দ্বারা কাজ করাইবে ও যাহারা অপরের কাজ করিবে এবং সেই সব ব্যাপারে স্বাধীন শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি কার্য ছাড়াও মজুরী এবং চাকুরী করার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা হওয়াও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল।

এইসব বিষয়ও ছিল স্বয়ং মানব সভ্যতার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, ইহা মূলতঃ কোন অপরাধজনক ও অন্যায়মূলক রীতি নহে। তাই ইহার উচ্ছেদ সাধনের চিন্তা করা অনাবশ্যক"। (৯, পৃঃ ১২-১৩)

উপরের উদ্ধৃতিতে শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী শোষণকে "মানব-সভ্যতার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি" হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের যে কোন ছাত্রই অবগত আছেন যে (ক) আদিম সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত উপার্জনকারী ও প্রয়োজনের চেয়ে কম উপার্জনকারীর অস্তিত্ব হয় ছিল না অথবা ক্রমশঃ তা কমে আসছে। (খ) সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে উত্তরাধিকারী প্রথা আদিম সাম্যবাদী সমাজে অনুপস্থিত ছিল। সমাজতান্ত্রিক সমাজে তা অংশতঃ চালু থাকলেও জন্মের পর প্রতিটি শিশুর জন্য বিকাশের মৌলিক সুযোগগুলি সমানভাবেই খোলা থাকে। জীবনযুদ্ধে কোন শিশুকেই সেখানে উত্তরাধিকারী প্রথার কারণে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় না। (গ) আদিম সাম্যবাদী সমাজে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে সকলেই (একমাত্র রুগ্ন ও অক্ষম ছাড়া) পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করে থাকেন। এসব সমাজে সম্পত্তির কোন ব্যক্তিমালিক বা শ্রমনিয়োগকর্তা নেই। রাষ্ট্রই

মালিক—রাষ্ট্রই নিয়োগকর্তা।

সুতরাং যেসব বিষয়কে মওদুদী সাহেব "মানবসভ্যতার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি" বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন সেগুলি আসলে একান্তভাবে ঐতিহাসিক এবং অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য। সভ্যতার উষালগ্নে এগুলি এক সময় অনুপস্থিত ছিল এবং সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ লগ্নে এগুলি আবার একদিন অপসৃত হবে। ইতোমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ-সমূহে এগুলির ক্রমবিলীয়মান প্রবণতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তি মালিকানা ও শ্রেণী বৈষম্যকে ধর্মীয় ফতোয়া, ভুল ঐতিহাসিক তথ্য এবং ভ্রান্ত দর্শনের দ্বারা যুক্তিসিদ্ধ করার সকল প্রয়াসই যখন ব্যর্থ হয় তখন মওদুদী ও মওদুদীর অনুসারীরা তাদের বক্তব্যের শেষাংশে কখনো কখনো একটি/দুটি "লেজ" এবং কিছু "কিন্তু" যোগ করে দেন। এসব "লেজ" এবং কিন্তুর" উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, দরিদ্র ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে একটু সান্তনা একটু বুঝ দেয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। মওদুদী বলেছেন, "মানুষ আল্লার পৃথিবীতে নিজ স্বভাব প্রকৃতির গতি, ঝোঁক ও মানসিক ভাবধারা এবং নিজ ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুপাতে স্বীয় জীবিকার সন্ধান নিজেই করিবে— ইসলাম মানুষের এই স্বাভাবিক অধিকারই স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে চরিত্র ধ্বংসকারী কিংবা সমাজ ও সভ্যতার শৃঙ্খলা চূর্ণকারী কোন উপায় অবলম্বন করিবার অধিকার কাহাকেও দেয় নাই। জীবিকা অর্জনের উপায় উপাদানগুলিকে ইসলাম হালাল ও হারাম এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যবর্তী তারতম্য সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে" (৯, পৃঃ-৩১)

অর্থাৎ পুঁজিপতিরা স্বীয় জীবিকার জন্য স্বভাবানুযায়ী সবই করতে পারবেন তবে "চরিত্র এবং শৃঙ্খলা" বজায় রেখে তা করতে হবে। "চরিত্র ও শৃংখলা" বজায় রাখার জন্য যেসব সংস্কারমূলক ব্যবস্থার কথা মওদুদী সাহেব এরপরে উল্লেখ করেছেন তার কোনটিই প্রকৃত বিচারে মৌলিক বা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন তিনি অর্থোপার্জনের "হারাম" উপায়গুলির মধ্যে যেগুলিকে চিহ্নিত করেছেন সেগুলি হচ্ছে ঃ

ক) মাদক দ্রব্য ব্যবসা।

খ) দেহ-ব্যবসা এবং সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে আয়।*

গ) জুয়ার মাধ্যমে আয় বা যে কোন ধরনের ফাটকাবাজি ব্যবসা।

ঘ) মজুতকারী/কালোবাজারীর মাধ্যমে আয়।

ঙ) সুদী কারবার।

চ) কৃপণের মত অর্থ এক জায়গায় অসঞ্চালিত অবস্থায় রেখে দেয়া।

পাশাপাশি মওদুদী সাহেব যেসব হালাল অর্থনৈতিক কর্ম সমাধা করার জন্য মোমেনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি হচ্ছে—

ক) নিয়মিত যাকাৎ প্রদান।

খ) মৃত্যুর পর শরীয়ৎ মোতাবেক প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যথাযথভাবে সম্পত্তি বন্টন করে দেয়া।

এসব সংস্কারমূলক পদক্ষেপের কোনটিই পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংগে মৌলিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তদুপরী এ সমস্ত বিধি-বিধানের মধ্যে ইসলামের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক বিধান মাত্র দুইটি ঃ জাকাত প্রথা ও রিবা বা সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ প্রথা। বাদ বাকী বিধানগুলি যে কোন সভ্য দেশের 'ক্রিমিনাল-ল' এর অন্তর্ভুক্ত অপরাধ দমনের মামুলী আইনগত বিধান মাত্র। তাই সর্বশেষ বিচারে বলতে হয় যে মওদুদী ও তার অনুসারীগণ আসলে ইসলামী সংস্কারের মোড়কে সেই পাশ্চাত্য পুঁজিবাদকেই এই দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন। যদিও তারা দাবী করেন যে "জাকাত প্রথা" এবং "রিবা" প্রথার কারণে ইসলাম "পুঁজিবাদের অসহনীয় বৈষম্যের" হাত থেকে অধঃস্তন শ্রেণীগুলিকে মুক্তি দিতে সক্ষম কিন্তু আসলে এই দাবীও যুক্তিযুক্ত নয়। পরবর্তী অধ্যায়ে তা প্রমাণিত হোল।

জাকাত ও রীবা প্রথার সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গ

সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ইসলামে যে সব সংস্কারমূলক কর্ম-সূচীর বিধান রয়েছে তার মধ্যে জাকাত এবং রীবা হচ্ছে অন্যতম। কিন্তু এই দুই কর্মসূচীরই রয়েছে অজস্র সীমাবদ্ধতা। প্রথমতঃ জাকাতের নির্ধারিত হার নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বিতর্ক রয়েছে জাকাতের ভিত্তি

* প্রবাদ আছে যে যিনি সঙ্গীত ভালবাসেন না তিনি অনায়াসে মানুষ খুন করতে পারেন।

কি হবে তা নিয়ে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে জাকাতের ভিত্তি বছর শেষে সঞ্চিত নীট সম্পদ। সুদূর অতীতে এই সম্পদ ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল খাদ্য শস্য, পশু সম্পদ এবং নগদ অর্থ/ধাতু এবং সেই সময় এদের জন্য বিভিন্ন রকম হারে জাকাত ধার্য করা হয়েছিল—(১) খাদ্য শস্য ও ফলমূলের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ (যদি জমি স্বাভাবিক বৃষ্টির দ্বারা সেচায়িত হয়) অথবা ৫ শতাংশ (কৃত্রিমভাবে সেচায়িত জমি) এবং (২) নগদ অর্থ ও মূল্যবান ধাতুর ক্ষেত্রে শতকরা আড়াই ভাগ। আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে বর্তমানে একটি সাদা-সাপ্টা জাকাতের হার ('ফ্ল্যাট রেট') অর্থাৎ শতকরা আড়াই ভাগের প্রথা চালু আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে এই বর্ধিত উৎপাদন ও প্রাচুর্যের যুগে জাকাতের এই স্বল্প হার মোটেও যথেষ্ট নয়। তদুপরি জাকাতের আদি নির্ধারণ রীতি ছিল অপ্রগতিশীল যা আধুনিক কর-নীতির সঙ্গে খাপ খায় না। এসব কারণেই বিভিন্ন মুসলীম প্রধান রাষ্ট্রে বর্তমানে আধুনিক কর ব্যবস্থাই কার্যকর রয়েছে এবং জাকাতকে একটি সম্পূরক স্বেচ্ছামূলক দান ব্যবস্থা হিসাবে পাশাপাশি চালু রাখা হয়েছে। কার্যতঃ অনেক ক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে জাকাতকে করহীন ঘোষণা করায় বড় ধনীরা 'জাকাত ফান্ডে' অর্থ প্রদান শ্রেয়ঃ মনে করেন। ধর্মীয় অনুশাসন সেখানে মুখ্য নয়—কর এড়ানো এবং সামাজিক সম্মান অর্জনই সেখানে মুখ্য প্রণোদনা হিসাবে কাজ করে থাকে।

রিবা বা সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধকরণের বিধানটিও ইসলামে সর্বদা কার্যকরভাবে অনুসৃত হয় না। মক্কার সমাজে ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে এবং পরে সর্বদাই মহাজনী ব্যবসা এবং সুদ গ্রহণ চালু ছিল। (৫, পৃঃ ৩৫) তবে একমাত্র খলীফা ওমর (রাঃ) এর সময় (৬৩৪-৪৪) সুদহীন রাষ্ট্রীয় ঋণ প্রদান প্রথা চালু থাকার ঐতিহাসিক স্বাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে ম্যাক্সিম রডিনসন এ ব্যাপারেও সন্দেহ প্রকাশ করে মন্তব্য করেছিলেন, "এমনকি এটাও সন্দেহজনক কারন সুন্নী ট্রাডিশানে খলীফা ওমরের রাজত্বকালকে সর্বদা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে আদর্শ হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তবু যদি আমরা আরো পরবর্তীকালের উৎসসমূহের ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করে নেই তাহলেও প্রাসঙ্গিক কাল পর্বটি হবে তেরশো বছরের মধ্যে মাত্র ১০টি বছর।" (৫, পৃঃ ৩৫)।

তবে সুদ গ্রহণের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা থাকলেও মুসলমানরা পবিত্র গ্রন্থের বিধানের কারণে এক্ষেত্রে সর্বদাই ইতস্ততঃ করেছেন। নিজেদের বিবেককে সান্তনা দেয়ার জন্য এবং দোষী চেতনা (গিল্টি কন্‌শাস্‌নেস) থেকে নিজেরা মুক্ত থাকার জন্য তারা 'রিবা' প্রসঙ্গে নানা বিচিত্র ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। এসব ব্যাখ্যার মাধ্যমে মূলতঃ তারা যেটা চেষ্টা করেছেন তা হচ্ছে টাকা ধার দিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ গ্রহণ করা হবে ঠিকই কিন্তু সেটাকে সুদ না বলে অন্য নামে অভিহিত করা হবে। তাহলে বাস্তবে ঋণদাতার লাভ ঠিকই থাকলো কিন্তু সেটাকে সুদ না বলায় সেটা আর হারাম হোল না।

এসব কৌশলগত মারপ্যাঁচের ক্ষেত্রে মুসলিম পণ্ডিতেরা যথেষ্ট উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। 'রিবা' এড়ানোর কৌশল যেসব পুস্তকে বর্ণিত রয়েছে সেগুলোকে একত্রে 'হিয়াল' শাস্ত্র হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে আবু বাকার আহমেদ আল খাসাফ (৮৭৪ খৃঃ), আবু হাটিম মাহমুদ আল খাজউইনী (প্রায় ১০৫০ খৃঃ), মোহাম্মদ্ ইবনে হাসান আশ্‌শায়েবানী (৮০৪ খৃঃ)—প্রমুখ লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের বক্তব্য অংশতঃ অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন জে. স্ক্যাক্ট। (৫, পৃ ৩৬)

'হিয়াল' যে এক ধরনের আত্মপ্রতারণা তা নীচের কৌশলটির উদাহরণ থেকে পরিস্কার হয়ে যাবে। বলা হচ্ছে—ধরা যাক আমি ক এর কাছে একটি জিনিস ১২০ টাকায় বিক্রী করলাম তবে ঠিক হোল যে জিনিসটার দাম সে আমাকে এখনই দিবে না—এক বছর পর দিবে। এইভাবে জিনিসটা পরবর্তীতে ১২০ টাকা পাওয়ার শর্তে এখনই হস্তান্তরিত হয়ে গেল। এখানে ইসলামী শরীয়ৎ লঙ্ঘিত হয় নি। এর পর মুহূর্তেই আমি পুনরায় দুজনের সম্মতিক্রমেই জিনিসটি তার কাছ থেকে ১০০ টাকায় কিনে নিলাম। এই দ্বিতীয় কাজটিও ইসলামী শরিয়ৎ অনুযায়ী হারাম বলে পরিগণিত হবে না। কিন্তু এই দুটি হালাল কাজকে এক্ষেত্রে বিবেচনা করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে বস্তুতঃ এখানে আমি ক-কে এক বছরের জন্য ১০০ টাকা ধার দিয়ে বছর শেষে ২০ টাকা সুদ গ্রহণ করেছি। যদিও সেই সুদকে এখন আর সুদ হিসাবে চেনা যাচ্ছেনা, ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা হিসাবে তা জায়েজ হয়ে গিয়েছে। আসলে আমরা সকলেই অবগত

আছি যে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শ্রেণী যে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরী করে থাকে তারই বিভিন্ন রূপভেদ হচ্ছে সুদ, মুনাফা, খাজনা ইত্যাদি।

এরূপ ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের বিশেষ একটি রূপভেদকে অনুমোদন না করলে—শোষকদের তাতে কোন অপূরণীয় ক্ষতি হয় না। তখন তারা অনায়াসে উদ্বৃত্ত মূল্যটিকে অন্যান্য অবশিষ্ট রূপগুলিতে রূপান্তরিত করে নিতে সক্ষম হয়। ফলে ভিন্ন নামে একই শোষণ অব্যাহত থাকে মাত্র। এই জন্য আধুনিক ব্যাংকিংকে ইসলামী অনুশাসনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য সবকিছু ঠিক রেখে সুদের জায়গায় লভ্যাংশ কথাটা বর্তমানে চালু হয়েছে।

এ ছাড়া যেহেতু প্রায় সকল দেশের ক্রয়-বিক্রয়-ব্যাংকিং ব্যবস্থা আজ বিশ্বপুঁজিবাদের আওতায় সম্পৃক্ত হয়ে গেছে সেহেতু ইসলামী ব্যাংকিং এর নামে তথাকথিত সুদহীন ব্যাংকিং বিচ্ছিন্নভাবে একটি দেশে চালু রাখাও খুবই কষ্টকর ও সমস্যা সংকুল হয়ে পড়েছে। ১লা জানুয়ারী ১৯৮১তে পাকিস্তানের ব্যাংকগুলিতে সুদহীন ইসলামী তহবিল চালু করা হয়েছিল। সেই সময় সিন্ধু প্রদেশের সামরিক 'গভর্ণর জেনারেল' এস. এম. আব্বাসী বলেছিলেন, "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুদ প্রদান বা গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং যারা এই ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারে না তারা গোটা ইসলামী ব্যবস্থার প্রতিই সন্দেহ প্রকাশ করেছে।" (৬) কিন্তু পাশাপাশি পাকিস্তানেরই অর্থ-সচিব জনাব হামিদ বেগ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে বিদেশী ব্যাংকে গচ্ছিত সরকারী তহবিলের জন্য সুদ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। (৬)

সুতরাং সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে ইসলামের সংস্কারমূলক কর্মসূচীগুলিও সঠিক অর্থে বাস্তবে কার্যকরী হয়নি। শুধু যে কার্যকরী হয়নি তাই নয় ইসলামকে ব্যবহার করেই ইসলামে যা নেই তা করা হচ্ছে এবং তার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হচ্ছে। খোদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেই এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পেয়েছি। সম্প্রতি স্বৈরাচারী একনায়কত্বকে ইসলামের নামে জায়েজ করার চেষ্টা হয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচারী শাসক জেনারেল জিয়া ঘোষণা করেছেন যে পাকিস্তানী মুসলমানরা, "এক আল্লায়, এক রসুলে, এক কেতাবে বিশ্বাসী এবং এক ব্যক্তি দ্বারা শাসিত হওয়াই তাদের মানসিকতা।" (৮, পৃঃ ৫০) ঠিক অনুরূপ ঘোষণা আমরা আমাদের বর্তমান

রাষ্ট্রপতির মুখে এখনো না শুনলেও—ইসলামকে রক্ষা করার জন্যই যে তার রাষ্ট্রপতি হওয়া এরূপ মন্তব্য প্রায়ই শুনে থাকি।

উপসংহার

অতএব ইসলাম নিছক কোন বিমূর্ত বিশ্বাস নয়। একটি বিষয় হচ্ছে পবিত্র গ্রন্থভুক্ত ইসলাম, আরেকটি বিষয় হচ্ছে নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট কালে প্রতিপালিত ইসলাম। বিমূর্ত ইসলামে বিভিন্ন ধরনের প্রগতিশীল সংস্কারমূলক বক্তব্য থাকলেও বর্তমানে যে মূর্ত ইসলাম চতুর্দিকে রয়েছে তা এসব শ্লোগানকে কার্যকরী করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ কথা ইসলামের ভক্তরা নিজেরাই আজ স্বীকার করে নিয়েছেন। ১৯৮১ সালে কুয়েতে অনুষ্ঠিত "ইসলামে ইসলামী অধিকার" শীর্ষক সেমিনারে এই মত ঘোষণা করা হয়েছে যে, "গোটা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন অস্তিত্ব নেই।" এই প্রবন্ধের আগের অধ্যায়ে বর্ণিত যুক্তিমালায় (৬) এই একই সত্যের প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু মৌল-বাদীরা এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করেন। তারা এখনো নিছক ধর্মীয় ভিত্তিতেই একটি সামগ্রিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সংগঠিত তৎপরতা চালাচ্ছেন। মৌলবাদীদের মধ্যে প্রাচীনপন্থীরা মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা নিয়ে তথাকথিত ইসলামী খিলাফৎ কায়েমের অবাস্তব স্বপ্ন দেখছেন। পক্ষান্তরে মওদুদীপন্থী আধুনিক মৌলবাদীরা ইসলামের মোড়কে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিচ্ছেন। বাংলাদেশে মওদুদীপন্থী এই নব-মৌলবাদই অধিক শক্তিশালী এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও শাসক দলের প্রচ্ছন্ন আশির্বাদও এদের পেছনে রয়েছে। এরা যে শুধু বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির শত্রু তাই নয়, সকল প্রকৃত ধর্মানুরাগী এবং সুফী ধারার অনুসারীরাও এদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকেন। তাই বর্তমানে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে মৌলবাদ বিরোধী ধর্ম-প্রাণ অসংখ্য মানুষের (বিশেষতঃ অধঃস্তন শ্রেণীগুলির) একটি ঐক্য বা মিলনের বাস্তব সম্ভাবনা ও প্রয়োজন রয়েছে।

পৃথিবীর বহু জায়গায় ধার্মিক মুসলমানেরা নানাভাবে নানা সময়ে নানা আর্থ-সামাজিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং করছেন। সেসব আশু ও সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক আন্দোলনের আধেয়

যদি আপেক্ষিক অর্থে প্রগতিশীল হয় তাহলে তাদের সঙ্গে প্রগতিশীলদের ইস্যুভিত্তিক ঐক্য ও সমঝোতা হতে পারে। ধর্ম বিশ্বাস বা বিশ্বাসহীনতা সেখানে বড় বাঁধা হিসাবে যাতে কাজ না করে সেটাই সকলের লক্ষ্য রাখা উচিৎ। বস্তুতঃ স্বর্গ আছে কি নাই, এই ধরনের অলৌকিক বিশ্বাসের ইস্যুকে কেন্দ্র করে সর্বহারার সংগ্রামকে দ্বিধাবিভক্ত করার চেয়ে এই লৌকিক ধরনীতে স্বর্গ রচনার সংগ্রামে সর্বহারাকে ঐক্যবদ্ধ করা বর্তমান বাংলাদেশে অধিকতর জরুরী কর্তব্য।

তথ্য নির্দেশিকা

১. মোঃ জাফরুল্লাহ খান, "ইসলাম-ইটস মিনিং ফর মডার্ণ ম্যান", রাটলেজ এণ্ড কেগান পল, লণ্ডন, ১৬২।
২. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, খণ্ড ৯।
৩. রিচার্ড পি. মিচেল, দ্য সোসাইটি অফ মুসলীম ব্রাদার্স, অক্সফোর্ড ইউনি-ভার্সিটি প্রেস লণ্ডন, ১৯৬৯ এ উধৃত।
৪. ড্যানিয়েল পাইপস, "ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট মুসলিমস—বিটউইন আমেরিকা এণ্ড রাশিয়া", ফরেন এফেয়ার্স ভল্যুম, ৬৪, নং-৫, সামার, ১৯৮৬, নিউইয়র্ক।
৫. ম্যাক্সিম রডিনসন, ইসলাম এণ্ড ক্যাপিটালিজম পেলিক্যান বুকস, পেঙ্গুইন পাবলিশার্স, ব্রিটেন,
৬. সচিত্র সন্ধানী, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১।
৭. লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, ভল্যুম-১০, প্রগতি প্রকাশনী, মস্কো, ১৯৭৮।
৮. হাসান গারদেজি ও কামিল রশিদ সম্পাদিত (তানভীর মোকাম্মেল অনুদিত), পাকিস্তান ধর্ম ও দ্বন্দ্বের রাজনীতি, ইউনিভারসিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৮৬।
৯. মওদুদী, সাইয়েদ অ বুল অ লা, অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান, ঢাকা আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৬।
১০. চিশতি সদরুদ্দিন আহমেদ, ইসলাম এগেইনষ্ট ইনইকুয়িটি এণ্ড মওদুদীস করাপশানস, ঢাকা, চলন্তিকা বইঘর, ১৯৭১।
১১. মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলা, ইসলাম ও আধুনিক মতবাদ, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, অক্টোবর, ১৯৮৭।

গ্রন্থপঞ্জী

১. অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী, "অর্থনৈতিক সাম্য ও ইসলাম," বই-কিতাব প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৭৬।
২. মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলা, "অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান," ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, জানুয়ারী, ১৯৮৬।

৩. Chisti, Sadruddin Ahmed. *Islam Against Inequity and Maudoodi's* Corruptions., Dhaka : Chalantika Bai Ghar, 1971.

৪. রহমান, মরেজুর, "ইসলামে ভূমি কৃষি ও শ্রম ব্যবস্থা," ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশান, ডিসেম্বর, ১৯৮১।

৫. মাসউদ, ফরদউদ্দীন, ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশান, ডিসেম্বর, ১৯৮২।

৬. Qutb, Muhammad, *Islam the misunderstood religion*, Dhaka, Adhunik Prokashani, Nov., 1978.

৭. ইয়াহ্‌ইয়া আরমাজানী, "মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান," ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর, ১৯৭৮।

৮. মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলা, ইসলাম ও আধুনিক মতবাদ। ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, অক্টোবর, ১৯৭৮।

৯. Izutsu, Toshiko, *The structure of the ethical terms in the Koran*, Tokyo : Keio Institute of Philological Studies, 1959.

১০. খান বদরুল আলম, "ধর্ম ও আজকের বিবর্তিত সমাজ," চট্টগ্রাম, সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৮৭।

১১. Ali, Hazrat (Ra), *A Classic Administrative Policy letter* of Hazrat Ali. (RA) (fourth Caliph of the Muslims) to Malik IBN Haris Ashter Governor Designate of Egypt edited by Shamsul Alam, Dhaka : Oct. 1976.

১২. হোসেনুর রহমান, "ইসলাম ঃ মৌলবাদ ও মৌল বিবাদ", দেশ, ২৫শে এপ্রিল ১৯৮৭ কলকাতা।

১৩. Dilip Hiro, *Iran Under the Ayatollahs*, London : Routledge and Kegan Paul, 1985.

১৪. Medvedko, L., and Germanovich, A., *Islam and Liberation Struggle* Moscow : Novosti Press Agency Publishing House, 1983.

১৫. হযরত মাওলানা মনসুরুল হক (সম্পাদক) মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রসুল (সঃ) এর মনোনীত ইসলাম বনাম মিস্টার মওদুদীর নিউ ইসলাম, ঢাকা ; ১৯৮৫।